অন্নপ্রাশন

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥অন্নপ্রাশন॥

খোকার অবস্থা শেষ রাত হইতে ভালো নয়।

কি যে অসুখ তা-ই কি ভালো করিয়া ঠিক হইল? জন্তিপুরের সদানন্দ নাপিত এ সব বিষয়ে কবিরাজী করে, ভালো কবিরাজ বলিয়া পসারও আছে। সে বলিয়াছিল, সান্নিপাতিক জ্বর মহেশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার একটাকা ভিজিটে রোগী দেখে, সে বলিয়াছিল, ম্যালেরিয়া মহেশ ডাক্তারকে আনিবার মতো সঙ্গতি থাকিলে এতদিন তাহাকে আনা হইত; কাল বৈকালে যে আনা হইয়াছিল সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে, খোকা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া খোকার মা কান্নাকাটি করিতে লাগিল, পাড়ার সকলেই মহেশকে আনিবার পরামর্শ দিল, পরিবারের গায়ের একমাত্র সোনার অলঙ্কার মাকড়ি জোড়াটা বাঁধা দিয়া আটটা টাকা কেশব ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া ও ভিজিটেই ডাক্তারের পাদপদ্মে ঢালিয়াছে। তবুও তো ওষুধের দাম বাকি আছে, নিতান্ত কম্পাউণ্ডারবাবু এখানে ডাকডোক পান, সেই খাতিরেই টাকা-দুই আন্দাজ ওষুধের বিলটা এক হপ্তার জন্য বাকি রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

এই তো গেল অবস্থা!

BANGLADARSHAN.COM

মহেশ ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, কোন আশা নাই। অসুখ আসলে নিউমোনিয়া, এতদিন যা তা চিকিৎসা হইয়াছে। রাতটা যদি বা কাটে, কাল দুপুরে 'ক্রইসিস্' কাটাইবার সম্ভাবনা কম।

কেশব এ কথা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে জানায় নাই। শেষ রাত্রের দিকে যখন খোকার হিক্কা আরম্ভ হইল, খোলার মা বলিল—ওগো, খোকার হিক্কা উঠেচে, একটু ডাবের জল দিলে হিক্কাটা সেরে যাবে এখন।

জল দেওয়া হইল, হেঁচ্‌কী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমিবার নামটিও করে না। অতটুকু কচি বালকের সে কি ভীষণ কষ্ট! এক একবার হেঁচ্‌কী তুলিতে তার ক্ষুদ্র দুর্বল বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আর তার কষ্ট দেখা যায় না, তখন কেশবের মনে হইতেছিল, "হে ভগবান! তুমি হয় ওর রোগ সারিয়ে দাও, নয় তো ওকে নাও, তোমার চরণে স্থান দাও, কচি ছেলের এ কষ্ট চোখের ওপর আর দেখতে পারি নে।"

সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই খোকা মারা গেল।

কেশবের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিতেই পাশের বাড়ী হইতে প্রৌঢ়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়েও আসিল। সামনের বাড়ীর নববিবাহিতা বধূটিও আসিল। বধূটি বেশ, আজ মাস-দুই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু খোকার অসুখের সময় দুবেলা দেখা শোনা করা, রোগীর কাছে বসিয়া খোকার মাকে স্নানাহারের অবকাশ দেওয়া, নিজের বাড়ী হইতে খাবার করিয়া আনিয়া খোকার মাকে খাওয়ানো—ছেলেমানুষ বৌয়ের কাণ্ড দেখিয়া সবাই অবাক্। এখন সে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। বড় নরম মনটা।

দশ মাসের ছেলে মোটে। শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

খোকাকে কাঁথা জড়াইয়া কেশব আগে আগে চলিল, তার সঙ্গে পাড়ার আরও তিন-চারজন লোক। ঘন বাঁশবাগান ও বনের মধ্যে সুঁড়ি-পথ। এত সকালে এখনও বনের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে নাই, হেমন্তের শিশিরসিক্ত লতাপাতা, ঝোপঝাপ হইতে একটা আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বাহির হইতেছে।

ওপাড়ার সতু বলিল—আর বেশীদূর গিয়ে কি হবে, কি বলো রজনী খুড়ো? এখানেই—

কেশব বলিল—আর একটু চল বিলের ধারে—

বিলের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া কাঁথা-জড়ানো শিশুকে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দশ মাসের দিব্যি ফুটফুটে শিশু, কাঁথা হইতে গোলাপ ফুলের মতো ছোট মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানিতে ছোট্ট একটুখানি হাঁ, মনে হইতেছে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেশবের কোলেই ছেলে, গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিবার সময় সে বলিল—গা এখনও গরম রয়েচে।

রজনী খুড়ো ইহাদের মধ্যে প্রবীণ, তিনি বলিলেন—আহা-হা, ওসব ভেব না। সতু, নাও না ওর কোল থেকে, ওর কোলে কি বলে রেখে দিয়েচ?

গর্ত্তে মাটি চাপান হইল। কেশব অবাক্ নয়নে গর্ত্তের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিল। ছোট্ট মুঠাবাঁধা হাত দুটি মাটি চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল।

BANGLADARSHAN.COM

রজনী খুড়ো বলিলেন—চল হে বাবাজী, ওদিকে আর চেও না। সংসার তবে আর বলেচে কেন? আমারও একদিন এমন দিন গিয়েচে, আমার সেই মেয়েটা—জান তো সবই। আজ আবার তোমার মনিব-বাড়ীর কাজ, তোমারও তো সেখানে থাকতে হবে। দেখ তো দিন বুঝে আজই—

কাজটা সাঙ্গ হইয়া গেল খুব সকালেই। বাড়ী যখন ইহারা ফিরিল, তখন সবে রৌদ্র উঠিয়াছে।

একটু পরে সান্যাল-বাড়ী হইতে লোক আসিল কেশবকে ডাকিতে। বলিল—আসুন মুহুরী মশায়, বাবু ডাকচেন। তিনি সব শুনেচেন, কাজকর্ম্ম করলে মনটাকে ভুলে থাকবেন, সেই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

আজ সান্ন্যাল-বাড়ীর মেজবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সান্ন্যালেরা গ্রামের জমিদার না হইলেও খুব সম্পন্ন গৃহস্থ বটে। পয়সাওয়ালা বর্দ্ধিষ্ণু। এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিও খুব। তেজারতিতে ষাট সত্তর হাজার টাকা খাটে। পাশাপাশি আট দশখানা গ্রামে এমন চাষী প্রায় নাই, যে সান্ন্যালদের কাছে হাত পাতে নাই।

কেশব বলিল, চল যাচ্চি, ইয়ে...বাড়ীতে একটু শান্ত করে যাই। মেয়েমানুষ, বড্ড কান্নাকাটি করচে।

সান্ন্যালেরা লোক খুব ভাল। বৃদ্ধ সান্ন্যাল মশায় কেশবকে দেখিয়া বলিলেন, আরে এস, এস কেশব। আহা, শুনলাম সবই। তা কি করবে বল? ও দেবকুমার, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল, কি রূপ, তোমার অদৃষ্টে থাকবে কেন? যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গিয়েচে! তা ও-আর ভেব না, কাজকর্ম্মে থাক, তবুও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে। দেখ গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ভাতের উনুনগুলো কাটা হচ্চে কি না। বৌমাকেও আনতে পাঠাচ্চি, তিনিও এসে দেখাশুনো করুন, কাজের বাড়ী ব্যস্ত থাকবেন।

মোটরে করিয়া একদল মেয়ে-পুরুষ কুটুম্ব আসিল।

শহরের লোক। মেয়েদের গহনার বাহার নাই, সে সব বালাই উঠিয়া গিয়াছে, শাড়ির রঙচঙে চোখ ধাঁধিয়া গেল। মেয়েরা ঠিকই কলিকাতার চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এ সব পাড়াগাঁয়ের শহরে পুরুষদের বেশভূষা নিজের নিজের ইচ্ছামত—ধুতির সঙ্গে কোট পরা এখানকার নিয়ম, কেউ তাতে কিছু মনে করে না।

চারিধারে হাসিখুশি, উৎসবের ধুম। কেশবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড বড় ফাঁকা, এদের হাসিখুশির সঙ্গে তার মিল খাইতেছে না। আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউই বোধ হয় জানে না, তার আজ সকালে কি হইয়া গিয়াছে...

একটি ভদ্রলোক চার বছরের একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, গায়ে রাঙা সিল্কের জামা, কোঁচান ধুতি পরনে এতটুকু ছেলের, পায়ে রাঙা মখমলের উপর জরির কাজ করা জুতো। কি সুন্দর মানাইয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

কেশবের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকটিকে বলে—শুনুন মশায়, আমারও একটি ছেলে ছিল, অবিকল এমনিটি দেখতে। আজ সকালে মারা গেল। আপনার ছেলের মতোই তার গায়ের রং।

মহিমপুরের নিকারীরা মাছ আনিয়া ফেলিল। গোমস্তা নবীন সরকার ডাকিয়া বলিল—ওহে কেশব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না, চট্ করে মাছগুলোর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে ওদের হাতচিঠেখানা সই করে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই—কাতলা আধ মনের বেশি হলে ফেরত দিও—শুধু রুইয়ের বায়না আছে।

নবীন সরকার জানে না তাহার খোকা আজ সকালে মারা গিয়াছে। কি করিয়া জানিবে, ভিন গাঁয়ের লোক, তাতে এই ব্যস্ত কাজের বাড়ীতে; সে খবর তাকে দেওয়ার গরজ কার?

কেশব একবার নবীন সরকারকে গিয়া বলিবে—গোমস্তা মশায়, আমার খোকাটি মারা গিয়েচে আজ সকাল বেলা। ফুটফুটে খোকাটি! বড় কষ্ট দিয়ে গিয়েচে।

নবীন সরকার নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। বল কি কেশব! তোমার ছেলে আজ সকালে মারা গিয়েচে, আর তুমি ছোটাছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছ! আহা-হা, তোমার ছেলে! আহা, তাই তো!

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেশব তো কাহাকেও কিছু বলিবে না।

মাছ ওজন করিয়া লইবার পরে দুধ-দই আসিয়া উপস্থিত। তারপর আসিল বাজার হইতে হরি ময়রার ছেলে, দু'মন-আড়াই মন সন্দেশ ও আড়াই মণ পান্তুয়া লইয়া। দই-সন্দেশ ওজন করিবার হিড়িকে কেশব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সপ বিছান, সামিয়ানা খাটান প্রভৃতি কাজ তদারক করিবার ভারও পড়িল তাহার উপর।

ইতিমধ্যে সকলেই সব ভুলিয়া গেল, একটা বড় গ্রাম্য দলাদলির গোলমালের মধ্যে। সকলেই জানিত, আজ হারাণ চক্রবর্ত্তীর বিধবা মেয়ের কথা এ সভায় উঠিবেই উঠিবে। সকলে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। প্রথমে কথাটা তুলিলেন নায়েব মশায়—তারপরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও পরিশেষে ওপাড়ার কুমার চক্রবর্ত্তী রাগ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কাজের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়ে গেলেন—অমন দলে আমি থাকি নে! যেখানে একটা বাঁধন নেই, বিচার নেই—সে সমাজ আবার সমাজ? যে খায় খাক, একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি বা আমার বাড়ীর কেউ খাবে না—আমার টাকা নেই বটে, কিন্তু তেমন বাপের—ইত্যাদি।

তিন-চারজন ছুটিল কুমার চক্রবর্ত্তীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে। কুমার চক্রবর্ত্তী যে একরোখা, চড়ামেজাজের মানুষ সবাই তা জানে। কিন্তু, ইহাও জানে যে, সে রাগ তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নায়েব মশায় বলিলেন—তুমি যেও না হরি খুড়ো—তোমার মুখ ভালো না, আরও চটিয়ে দেবে। কার্ত্তিক যাক, আর শ্যামলাল যাক—

BANGLADARSHAN.COM

হারাণ চক্রবর্ত্তীর যে মেয়েটিকে লইয়া ঘোঁট চলিতেছে, সে মেয়েটি কাজের বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। পাশের বাড়ীর গোলার নিচে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, আজই একটা মিটিং হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত সামাজিক নিষ্পত্তি কিছু হইবে, তাহা সে জানিত এবং তাহারই ফল কি হয় জানিবার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই নাম কুমার চক্রবর্ত্তীর মুখে ওভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পাঁচিলের ঘুলঘুলি দিয়া দুরু দুরু বক্ষে ব্যাপারটা কি দেখিবার চেষ্টা পাইল।

পাঁচিলের ওপাশে নিকটেই কেশবকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল—কাকা, ও কাকা—

কেশব কাকাকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে, কেশব কাকার মতো নিপাট ভালোমানুষ এ গাঁয়ে দুটি নাই।

আহা, সে শুনিয়াছে যে, আজই সকালে কেশব কাকার খোকাটি মারা গিয়েছে, অথচ নিজের দুর্ভাবনায় আজ সকাল হইতে সে এতই ব্যস্ত যে, কাকাদের বাড়ী গিয়া একবার দেখা করিয়া আসিতে পর্য্যন্ত পারে নাই।

কেশব বলিল—কে ডাকে? কে, বিদ্যুৎ? কি বলচ মা? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হারাণ চক্রবর্ত্তীর মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। খুব সুন্দরী না হইলেও বিদ্যুতের রূপের চটক আছে সন্দেহ নাই, বয়স এই সবে ঊনিশ।

বিদ্যুৎ ম্লানমুখে গলার সুমিষ্ট সুরে অনেকখানি খাঁটী মেয়েলী সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—কাকা, খোকামণি না কি নেই? আমি সব শুনেছি সকালে। কিন্তু কোথাও বেরুতে পারিনি সকাল থেকে, একবার ভেবেছিলুম যাব।

কেশব উত্তর দিতে গিয়া চাহিয়ে দেখে বিদ্যুতের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এতক্ষণ এই একটি লোকের নিকট হইতে সে সত্যকার সহানুভূতি পাইল। কেশব একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তা যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—যা। ও ঘোঁটের কথা শুনে আর কি হবে, তুই বাড়ী যা। কুমার চক্কোত্তি রাগারাগি করে চলে গিয়েচে, ওকে সবাই গিয়েচে ফিরিয়ে আনতে। তোর ওপর খুব রাগ কুমারের। তবে ও তো আর সমাজের কর্ত্তা নয়, ওর রাগে কি-ই বা এসে যাবে!

—কি বলছিল ওরা?

—তুই নাকি এখনও গাঙ্গুলী বাড়ী যাস্, তোকে ওদের টিউবকলে জল তুলতে যেতে দেখেছে কুমারের স্ত্রী। কোন্‌দিন নাকি ওদের নারকোল তলায়—ইয়ে, সুশীলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলি, তাও কুমারের স্ত্রী দেখেছে—এই সব কথা।

বিদ্যুৎ বলিল—আমি যাইনি কাকা, সেবার সেই বারণ করে দেওয়ার পর থেকে আর কখনো যাইনি।

BANGLADARSHAN.COM

এ কথাটি বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিল। সুশীলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা হইতেই আলাপ। সুশীল যখন কলেজে পড়িত, তখন বিদ্যুৎ বার তের বছরের মেয়ে। সুশীলদা'র দেখা পাইলে তখন হইতেই সে আর কোথাও যাইতে চায় না।

সুশীলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাহারা বৈদিক আর সুশীলেরা রাঢ়ীশ্রেণী। বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল পাশের গ্রামের শ্রীগোপাল আচার্য্যের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বিধবা হইয়াছে বিবাহের দু' বছর পরেই। শ্বশুরবাড়ী মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ এখানেই থাকে। সুশীলের সঙ্গে তাহার ছেলেবেলার মাখামাখি লইয়া একটা অপবাদ গ্রামের মাঝে রটিয়াছিল। এই অপবাদের দরুণই তাহারা এখন গ্রামে একঘরে হইয়া আছে, এ বাড়ীতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঝুমুর গানের দল আসিয়া হাজির হইল। সামিয়ানার একধারে ইহাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা, দল আসিতেই সেখানে গিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিল। কেশব ছুটিয়া গেল গোলমাল থামাইতে। দলের অধিকারী বলিল—ও সরকার মশাই, আমাদের একটু তামাক-টামাকের যোগাড় করে দিন, আর দু-পাঁচ খিলি পান। রোদ্দুরে বামুনগাঁতির বিল পার হতে যা নাকালটা হয়েচে সবাই মিলে!

বেলা বারোটার সময় কেশব একবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। স্ত্রীর জন্য তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, বেচারী এ বাড়ী আসিয়াছে তো,—না খালি বাড়ীতে একা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে?

না, দেখিয়া আশ্বস্ত হইল স্ত্রী আসিয়াছে ও ইঁদারার পাড়ে একরাশ পুরোনো বাসন ঝিয়ের সঙ্গে বসিয়া মাজিতেছে, তাহাদের আজ মরণাশৌচ, বাহিরের কাজকর্ম্ম ছাড়া অন্য কাজ করিবার জো নাই।

মেজবাবুর যে-খোকার অন্নপ্রাশন, দালানে খাটের উপর সুন্দর বিছানাতে চারিদিকে উঁচু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ন' মাসের হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি শিশু, গায়ে একগা গহনা, সামনের গদীতে একখানা থালে যে সব বিভিন্ন অলঙ্কার আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে দিয়াছে, সেগুলি সাজানো। তিন-চার ছড়া হার, সোনার ঝিনুক, পদক, তাগা, বালা, রূপার কাজললতা। চারিধারে ঘিরিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, ইহারা কেউ কেউ এ গ্রামের বৌ-ঝি, কিন্তু বেশির ভাগই নবাগতা কুটুম্বিনীর দল। সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত আপ্-ডাউন যে তিনখানা ট্রেন যায়, প্রত্যেক ট্রেনের সময়ে দু' তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া ইহারা কোন দল কোলকাতা হইতে, কোন দল বা রাণাঘাট, কি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, কি শান্তিপুর হইতে আসিয়াছে। শহরের মেয়ে, কি সব গহনা ও শাড়ির বাহার, কি রূপ, কি মুখশ্রী, যেন এক একজন এক একখানি ছবি!

BANGLADARSHAN.COM

খোকাটি কেমন চমৎকার হাসিতেছে। কেমন সুন্দর মানাইয়াছে ওই বেগুনী রংয়ের জামাটাতে। তাহার খোকারও অন্নপ্রাশন দিবার কথা ছিল এই মাসে।

গরীবের সংসার, খোকার যখন চার মাস বয়স, তখন হইতে ধীরে ধীরে সব যোগাড় করা হইতেছিল। কাপালীরা মুসুরি ও ছোলা দিয়াছিল প্রায় আধ মন, নাড়ুর চালের জন্য ধান যোগাড় করা হইয়াছিল, সাত-আটখানা খেজুরের গুড় দিয়াছিল বাগদীপাড়ার সকলে মিলিয়া। বৃদ্ধ ভুবন মণ্ডল বলিয়াছিল—মুহুরী মশায়, যত তরিতরকারী দরকার হবে, আমার ক্ষেত থেকে নিয়ে যাবেন খোকার ভাতের সময়। এক পয়সা দিতে হবে না। কেবল বামুন-বাড়ীর দুটো পেরসাদ যেন পাই। শূদ্র-ভদ্র সবাই খোকাকে ভালবাসিত।

মেজবাবুর খোকার গায়ের রং অনেক কালো তার খোকার তুলনায়। মেজবাবু নিজে কালো, খোকার খুব ফরসা হইবার কথাও নয়। সুতরাং এদের মানানো শুধু জামায় গহনায়। তাহার খোকা গরীবের ঘরে আসিয়াছিল। এক জোড়া রূপার মল ছাড়া আর কোন-কিছু খোকার গায়ে ওঠে নাই।

আজ শেষ রাত্রে খোকার সেই হেঁচ্‌কীর কষ্টে কাতর কচি মুখখানি, অবাক্ দৃষ্টি, নিষ্পাপ, কাচের চোখের মতো নির্ম্মল ব্যথাক্লিষ্ট চোখদুটি...আহা, মানিক রে!

—ও কেশব, বলি হ্যাদ্দেশ্যে এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে! বেশ লোক যা হোক। ব্রাহ্মণদের পাতা করবার সময় হ'ল, সামিয়ানা খাটাবার ব্যবস্থা কর গে। আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চোদ্দভুবন, আর তুমি এখানে, বেশ নম্বুরী নোটখানি বাবা! পা চালিয়ে দেখ গিয়ে—

নবীন সরকার।

কিন্তু, নবীন সরকার তো জানে না...

সে কি একবার বলিবে?...ও গোমস্তা মশায়, এই আমার খোকা আজ সকালে...ও রকম ক'রে আমায় ডাকবেন না...আমার মনটা আজ ভাল না...

দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে নানা গ্রাম হইতে। এগারোখানা গাঁ লইয়া সমাজ, সমাজের সকলেই নিমন্ত্রিত। বড় বৈঠকখানায় লোক ধরিল না, শেষে লিচুতলায় প্রকাণ্ড শতরঞ্জ পাতিয়া দেওয়া হইল। আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেউলে সরাবপুরের বরদা বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারাণ চক্কোত্তি সমাজে একঘরে, তাদের বাড়ীর কারুর কি নেমন্তন্ন হয়েচে আজ কাজের বাড়ীতে? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ীর কেউ যদি এ বাড়ীতে আজ এসে থাকেন, তবে আমি অন্ততঃ দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে বলচি যে, আমরা এখানে কেউ জলস্পর্শ করব না।

আরও দু'পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা সমস্বরে এ কথা সমর্থন করিল। অনেকে আবার হারাণ চক্রবর্ত্তীর আসল ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। ছেলে-ছোকরার দল না বুঝিয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

এ বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তা সান্ন্যাল মশায়ের ডাক পড়িল। তিনি কাজের বাড়ীতে কোথাও ব্যস্ত ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গাঁয়ের সমাজ বড় গোলমেলে, তাহা তিনি জানিতেন। পান হইতে চুন খসিলেই এই তিনশো নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এখনই হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিবে, খাইব না বলিয়া শুভকার্য্য পণ্ড করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে। প্রাচীন, বিচক্ষণ ব্যক্তি সব, কিন্তু সামাজিক ঘোঁটের ব্যাপারে ইহাদের না আছে বিচার-বুদ্ধি, না আছে কাণ্ডজ্ঞান।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও সান্ন্যাল মশায় সভার মধ্যে খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আপনাদের সকলকেই জানাচ্চি যে হারাণ চক্কোত্তির বাড়ীর একটি প্রাণীও আমার বাড়ী নিমন্ত্রিত নয়, তাদের কেউ এ বাড়ীতে আসেনও নি! কিন্তু, আমার আজ অনুরোধ, এই সভাতেই সে ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। হারাণ আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়ীর পাশেই তার বাড়ী। তার ছেলে-মেয়ে আমার নাতি-নাতনীর বয়সী। আজ আমার বাড়ীর কাজ, আর তারা মুখ চুন করে বাড়ী ব'সে থাকবে, এ বাড়ীতে আসতে পারবে না, খুদ-কুঁড়ো যা দুটো রান্না হয়েচে তা মুখে দিতে পারবে না, এতে আমার মন ভালো নেয় না। আপনারা বিচার করুন তার কি দোষ—আমাদের গাঁয়ের লোক মিলে আজ সকালে একটা মিটিং আমরা এ নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সকলে উপস্থিত না হ'লে ব্যাপারটা উত্থাপন করা ভালো নয় ব'লে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার যদি মত শোনেন, আমি বলি হারাণ চক্কোত্তির মেয়ে নির্দ্দোষ, তাকে সমাজে নিতে কোন দোষ নেই।

ইহার পর ঘণ্টা-দুই-ব্যাপী তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইল, আজ সকাল বেলার মতোই। এই সভায় সবাই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাই। চড়া গলায় সকলেই কথা বলে, কথার মধ্যে যুক্তি-তর্কের বালাই নাই। দেখা গেল, এ

গাঁয়ের হারাণ চক্রবর্ত্তীর ব্যাপার লইয়া দুটো দল, একদল তাহাকে ও তাহার মেয়েকে একঘরে করিয়া রাখিবার পক্ষে মত দিল। অপর পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে। হারাণ চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়িল, তাঁর বয়স যদিও খুব বেশী নয়, কিন্তু কানে একেবারে শুনিতে পান না। টাইফয়েড হইয়া অল্প বয়স হইতেই কান দুটি গিয়াছে। তিনি হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, তাঁহার মেয়েকে তিনি ভালো রকমই জানেন, তার স্বভাব-চরিত্র সৎ। যে ছেলেটিকে লইয়া এ কথা উঠিয়াছে, গাঙ্গুলীবাড়ীর সেই ছেলেটি কলেজের পাস, উঁচু নজরে কাহারও দিকে চায় না। ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যুতের সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো মেশামেশি, এর মধ্যে কেউ যে কিছু দোড় ধরিতে পারে—ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বিরুদ্ধ দলের কর্ত্তা কুমার চক্রবর্ত্তী রাগিয়া উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহা আমাদের মনে আছে, কিন্তু সে সব কথা পাড়াগাঁয়ের দলাদলি-সভায় উচ্চারিত হইতে পারিলেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়।

অনেক করিয়াও হারাণ চক্রবর্ত্তীর হিতাকাঙ্ক্ষী দল কিছু করিতে পারিল না। কুমার চক্রবর্ত্তীর দলই প্রবল হইল। আসলে বিদ্যুৎ যে খুব ভালো মেয়ে, বিদ্যুতের মনটি বড় নরম, পাড়ার আপদ-বিপদে ডাকিলেই ছুটিয়া আসে এবং বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করে, তাহার উপর সে ছেলেমানুষ, এখনও তত বুঝিবার বয়স হয় নাই, বৃদ্ধের দলের আসল যুক্তি এই। কিন্তু, এ সত্য কথা সভায় দাঁড়াইয়া বলা যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

কুমার চক্রবর্ত্তীর দলের লোকেরা বলিল—সেবার সুরেনের মেয়ের বিয়ের সময় আমরা তো ব'লে দিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ সুশীলদের বাড়ী যাতায়াত বা সুশীলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করুক। এক বছর আমরা যদি দেখি, সে আমাদের কথা মেনে চলেচে, তবে আমরা তাদের দলে তুলে নেব—কিন্তু সে কি তা শুনেচে?

হারাণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—কৈ কে দেখেচে—বলুক কবে আমার মেয়ে এই এক বছরের মধ্যে—

কিন্তু এমন ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে দেখিবার লোকের অভাব হয় না।

দেখিয়াছে বৈ কি! বহু লোক দেখিয়াছে। পরের বাড়ী কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য যাহারা ওত পাতিয়া থাকে, তাদের চোখে অত সহজে ধূলা দেওয়া চলে না।

অবশেষে কে বলিল—আচ্ছা, কাউকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হোক না—সে যদি আমাদের সামনে স্বীকার করে, সে ওখানে যাতায়াত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাট স্বীকার করে, কথা দেয় যে, আর কখনও এ কাজ সে করবে না, তবে না হয়—

বিদ্যুৎ পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

কেশব গিয়া বলিল—মা আছিস? রাজী হয়ে যা না, ওরা যা যা বলচে। কেন মিছে মিছে—

বিদ্যুৎ কাঁদিয়া বলিল—আপনি ওদের বলুন আমি সব তাতে রাজী আছি কাকা।

সভার মধ্যে বাপকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া লজ্জায়, দুঃখে সে মরিয়া যাইতেছিল...তার জন্যই তার নিরীহ পিতার এ দুর্দ্দশা...তা ছাড়া তার দাদা শ্রীগোপালের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আজ পাঁচ ছ' দিন হইতে যজ্ঞিবাড়ীর নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে অধীর হইয়া আছে, ছেলেমানুষ তারা কি বোঝে—অথচ আজ তাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এবাড়ীতে আসিতে না পাইয়া মুখ চুন করিয়া বেড়াইতেছে—ইহা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা, ওদের বালি থেকে ডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেছ খাব, না পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—

তার মা ধমক দিয়া থামাইয়া রাখিয়াছে—থাম্, এখন চুপ কর্। যখন যাবি তখন যাবি। তা না এখন থেকে—এখন বরং একটু ঘুমো দিকি। ঘুমিয়ে উঠে আমরা সেই বিকেলে তখন সবাই যাব।

ঘরে বাহিরে বিদ্যুতের আর মুখ দেখাইবার জো নাই।

কিন্তু, কেশবের কথায় কি হইবে। এক আধটি বাজে লোকের প্রস্তাবেই বা কি হইবে। বরদা বাঁড়ুয্যে ও কুমার চক্রবর্ত্তী এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। একবার যে শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আর শর্ত্ত করিয়া ফল নাই। আর এ শর্ত্তের ব্যাপার নয়। একটা স্ত্রীলোককে সামাজিক শাসন করা হইতেছে ইহার মধ্যে শর্ত্তই বা কিসের? মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া যে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই এতদিন, ইহাই যথেষ্ট।

BANGLADARSHAN.COM

সুতরাং হারাণ চক্রবর্ত্তী যেমন একঘরে ছিলেন, তেমনই রহিয়া গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা। কেশবের মরণাশৌচ, সে পরিবেশন করিবে না, ভিখারী বিদায়ের ভার পড়িল তার উপর। দু' তিন দফা ব্রাহ্মণ খাওয়ান ও ভিখারী বিদায় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে শূদ্রভোজন, সে চলিল রাত দশটা পর্য্যন্ত।

কেশব সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন খাইতে বসিল, তখন রাত এগারটা। আয়োজন ভালই হইয়াছিল, কিন্তু এত রাত্রে জিনিসপত্র বেশি কিছু ছিল না। কেবল দই ও মিষ্টি এবং দু' তিন রকমের টক তরকারি দিয়া কেশব পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই জনের আহার একা করিল। পরে স্ত্রীকে লইয়া অন্ধকারেই নিজের বাড়ী রওনা হইল।

কেশবের স্ত্রীও খুব খাইয়াছে। কেশবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তা গিন্নীর বড় মেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে। নিজের হাতে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে গেল। খুব যত্ন করেচে। রান্নাবান্না কি চমৎকার হয়েচে, না?

কেশব বলিল—তা বড়লোকের ব্যাপার, চমৎকার হবে না? নয় তো এমন অসময়ে কপি কোথা থেকে এই পাড়াগাঁয়ে আসে বল দিকি? পেয়েছিলে কপির তরকারি?

–তা আর পাইনি? দু' দুবার দিয়েচে আমার পাতে। হ্যাঁ গা, এখন কপি কোত্থেকে আনালে? কলকাতায় কি বারমাস কপি মেলে?

বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় একটা মাটির প্রদীপ তখনও টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে। কেশবের স্ত্রী বলিল–ও বাড়ীর ছোট-বৌ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েচে, আহা বড় ভালো মেয়ে! আজ সকালে কেঁদে একেবারে আকুল।

সকালে যে ভাবে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঘরবাড়ী সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। কারো সাড়া-শব্দ নাই,–নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। আশে পাশে ঘন অন্ধকার, কেবল তুলসীতলায় ওই মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোটুকু ছাড়া।

কেশব শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেশব স্বপ্ন দেখিতেছিল, বিদ্যুৎ আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিতেছে–কাকা, আজই বুঝি...একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু যে দুর্ভাবনা আমার ওপর দিয়ে আজ সারাদিন...

বাহিরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল–সর্ব্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়া রোগী, বাঁশতলায় তার ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে!...পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরটুকু ছুটিয়া যাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবিল–আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল...হঠাৎ দেখিল সে কাঁদিতেছে, অঝোর ধারে কাঁদিতেছে...বাহিরে ঐ বৃষ্টিধারার মতো অঝোর ধারে...বারবার তার মনে হইতে লাগিল–তখনও ওর গা গরম ছিল...বেশ গরম ছিল...

॥সমাপ্ত॥